একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Double-voicedness in Self-narration: Rabindra's artistic vision in the Short-stories

আত্মকথনে দ্বৈত-জবানি: রবীন্দ্র-গল্পের শিল্পভাবনা

Name of the Author: **Dr. Yadabesh Acharya**

Affiliation: **SACT, Bengali Department, Gushkara Mahavidyalaya**

West Bengal, India

Abstract: Rabindranath Tagore has used observational points of view in a remarkable way in his story. The idea of self-narration (atmakathan) was born from this idea. He has brought novelty to the story by applying the peculiarity of self-narration. The use of dual voice in self-narration also brings variety to his stories. In this way, Rabindranath tried to create a special psychological background in his stories - Which is sometimes supernatural, sometimes strange, unbelievable, unreal. There are seven such short stories, which are -'kankal', 'Manihara', 'Nishite', 'khuditapasan', 'Durasa', 'Ditactive', 'Bosthomi'. The first self-narrator of the 'Kankal's story is heard by the disembodied woman, who is actually the second self-narrator of the main story. The story told by the second narrator is the main story. The skeleton's past love and its feminine psychology make the story unique. In 'Nishithe', the first self-narrator of the story is the doctor and his patient Dakshinacharan is the second self-narrator. The complex problems in Dakshinacharanbabu's life have turned into his illness. The story of his mental illness has created a special supernatural atmosphere. When love came into Dakshinacharan's life for the second time, he could still hear the worried voice of his sick first wife. This mental discomfort has taken an extraordinary form in double self-narration. The first narrator of the story of the 'khudita Pasan' was a railway passenger, the second self-narrator. Stories of supernatural environments emerge from their conversations. Every character, narrator, and reader was Involved in the story of the Iranian woman and the mysterious palace. The surreal supernatural atmosphere seems to overwhelm everyone. The first self-narrator presents himself in the story from an interested perspective, instilling distrust in the mind. This makes it feel as if the supernatural has consumed every character. The second self-narrator, in a supernatural daze, felt an irresistible attraction to the Iranian woman and rushed to the palace. Also the first self-narrator becomes more self-conscious about this environment, he becomes more curious about Iranian women. The entire situation is presented in the story through psychological modern life-questioning in a dual self-narration. The next stories are 'Manihara', 'Durasha', 'Detective' and 'Bostami'. Of these, 'Manihara' is a story of supernatural setting, 'Durasha' is a romance – in both of these stories the narrator is active in the search for reality. The narrator's ego, arrogance, and overconfidence in the 'Detective' story pose questions about the credibility of the reader. On the other hand, the author's self-inquiry and believable presentation of 'Detective' story. The story of 'Bostomi' reflects Rabindranath's own life. Therefore, He very consciously unfolds the life philosophy of the person (Bostami) he knew in the double-voice of self-narration.

Keywords: Rabindranath, Short Stories, Points of view, Self-narration (atmakathan), Dual-voice, Psychological

আত্মকথনে দ্বৈত-জবানি: রবীন্দ্র-গল্পের শিল্পভাবনা

ড. যাদবেশ আচার্য

"রবীন্দ্রনাথের বেশীরভাগ ছোটগল্পই একান্তভাবে গীতিকবিতার ধর্ম "[১] লাভ করেছে। রবীন্দ্র জীবদ্দশাতেই একথা সমালোচকদের মুখের ভাষা হয়ে উঠেছিল। যা কবি খুব প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেননি । মুশকিল হচ্ছে, ছোটগল্পকে গীতিধর্মী বললে অনেক সময়ই মনে করা হয় যে, এর মানে হল, ছোটগল্প যেন কবিতার প্রায়, যেন তার মধ্যে বাস্তবতা, বাস্তব অভিজ্ঞতার লেশমাত্র নেই। যেন কবিত্ব ও ভাবোচ্ছ্বাস সম্বল করেই ছোটগল্প লিখে ফেলা যায়। রবীন্দ্রনাথ কথাটিকে এভাবে গ্রহণ করার ফলে বলেছিলেন, 'গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতিধর্মী বললে ভুল করবে।' ('সাহিত্য গান ও ছবি', প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮) । নেহাত ওই 'কঙ্কাল' কিংবা 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ 'কল্পনার প্রাধান্য' আছে মাত্র অর্থাৎ খানিকটা কবিত্ব জাতীয় পদার্থ আছে কিন্তু সে যেন ব্যতিক্রম; অন্য অজস্র গল্পের নাম করতে করতে তিনি অনবরত বলতে থাকতেন – এই যে এইসব গল্প এইগুলি কি গীতিকবিতা? গান জাতীয় পদার্থ?

আসলে ভালো ছোটগল্প যে ভালো হয়েই গীতিধর্মী – এর কারণ এই নয় যে ওই গল্পে অনেক গান বা কবিত্ব রয়েছে; এর কারণ গড়নের দিক দিয়ে একটি ভালো ছোটগল্প একটি ভালো গীতিকবিতার মতোই একটিমাত্র ভাবের ঘনীভূত রূপ। ভাবান্তর ঘটলেই যেমন একটা ভালো গীতিকবিতায় ভাঁজ পড়ে যায়, একটি ভালো ছোটগল্পেও একমুখিনতা ক্ষুণ্ণ হয়। নীহাররঞ্জনের ভাষায়, "চিত্তের একটা বিশেষ মুড বা ভাব"[২] থেকেই যেমন রবীন্দ্র কবিতা, তেমনি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প জন্মলাভ করেছে । আর সেই কারণেই তাঁর ছোটগল্প "অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতিকবিতারই গদ্যরূপ"[৩]।

এই যে 'চিত্তের একটা বিশেষ মুড' – এই মুড কি কবি চিত্তের মতোই গল্পকারের-চিত্তেরও ব্যক্তিগত মুড বা Personal mood? নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনেকটা সেরকমই বলতে চেয়েছেন। তিনি একটি ইংরেজি বচন উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, ছোটগল্প হচ্ছে গল্পকারের "Perfect opportunity to project himself."[৪] তাঁর কথায় "প্রত্যেকটি গল্পের নায়ক-নায়িকা ও পার্শ্বচরিত্র – লেখকেরই বহুরূপী অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় "[৫]। নিশ্চয় কথাটিতে কিছুটা অত্যুক্তি আছে । তবু শুধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নয়, অনেক গল্প সমালোচকেরাই, এদেশের বা বিদেশের, ছোটগল্পের ওই ভাবৈক্যের মধ্যে গল্পকারের আত্মগত ভাবকে খুঁজেছেন। তাঁরা নানা ভাবে বলতে ছেয়েছেন, ছোটগল্প যে কথাসাহিত্যের লিরিক, তার কারণ শুধু গঠনগত নয়, ব্যক্তিগতও বটে; লিরিক যেমন একলা কবির গান, ছোটগল্পও তেমনই একলা গল্পকারেরই গল্প।

প্রসঙ্গক্রমে এতক্ষণ ধরে যে 'ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম' তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট করি – আত্মকথনরীতির শিল্পরূপের আলোচনায় রবীন্দ্র-গল্প বিশেষের 'আমি'কেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে রবিঠাকুরের 'ব্যক্তিগত আমি' রূপে ভাবতে রাজি নই। বরং ছোটগল্পে গল্পকারের আত্মপ্রক্ষেপণের একটা বড় জায়গা আছে একথা মেনে নিয়েই আমরা গল্পবিশেষের 'আমি'কে যথাসম্ভব গল্পবিশেষের অভ্যন্তরীণ অনিবার্যতার সূত্রপথেই বুঝে নিতে ও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছুক । অর্থাৎ অমুক গল্পটি কেন 'আমি'র 'দৃষ্টিকোণে' বা উত্তমপুরুষের

দৃষ্টিকোণে বিন্যস্ত হল? এমন প্রশ্ন উঠলেই সেই অমুক গল্পটিতে খোদ রবীন্দ্রনাথের কোনো ব্যক্তিগত ছায়াপাত ঘটেছে – এমন কোনো পূর্বনির্ধারিত উত্তর মিলিয়ে দেওয়ার সরলীকরণে আমরা প্রস্তুত নই।

পার্শি লাবক ' fiction'এর যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গকে ' point of view' বলেছেন তাকেই কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নিরীক্ষণবিন্দু বা গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মতে প্রচল ভাষায় 'দৃষ্টিকোণ' বলতে পারি। "কাহিনীর কথক যে অবস্থান বা কোণ থেকে গল্পটি বিন্যস্ত করেন – তাই হল কথাসাহিত্যের নিরীক্ষণবিন্দু" [৬]। পরবর্তীকালে কথকের এই অবস্থানগত তাৎপর্যকে সমালোচকেরা 'focalization', 'perspective', 'orientation' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে বিশ্লেষণ করেছেন [৭]। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কথকের জবানি ব্যাকরণগত ভাবে নিজস্ব স্থান নির্ণয় করে থাকে – যখন কোনো গল্পে কথক নিজস্ব জবানিতে গল্প বর্ণনা করবে তখন তাকে উত্তমপুরুষের কথকের দৃষ্টিকোণ বা আত্মকথনরীতি বলবো। তাহলে রবীন্দ্রনাথের সেই গল্পগুলিরই আমরা শিল্পরূপ আলোচনা করবো যেগুলি আত্মকথনরীতির দ্বৈত-জবানিযুক্ত গল্প বা উত্তমপুরুষের দ্বৈত-জবানিযুক্ত গল্প। আর এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রক্ষেপ লক্ষ করা গেলেও তা আমাদের আলোচনার বাইরে থাকবে। স্বয়ং 'আমি'ই যেখানে আত্মকথনে আত্মস্বরূপের উন্মোচন ঘটাচ্ছে সেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নানাভাবে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উত্তমপুরুষের কথক বা 'আমি'-কথক গল্পের বর্ণনকর্তা হওয়ার জন্য অনেক বেশি ব্যক্তিস্বাধীন, তাই অনেক সময়ই পক্ষপাতিত্ব দোষ লক্ষ করা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথের গল্পের 'আমি'-কথকেরা আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিজের "অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত হয়ে স্বীকারোক্তির প্রক্রিয়ায় নির্ভার হয়ে ওঠার সাধনায় ব্রতী হয়, তখন সাধনাবৈগুণ্যেই সে রূপান্তরিত হয় এক নিকষিত মানুষে।" [৮] প্রত্যেক কথকই নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকার জন্য গল্প শেষে নিজের অন্তরসত্তাকেই প্রকাশ করছে নির্দ্বিধায়। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কথকের উপর থাকলেও গল্পের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই তা স্বতঃস্ফূর্তরূপে উন্মোচিত হয়েছে। সংগত কারণেই রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রক্ষেপের প্রশ্ন উঠলেও আত্মকথনের শিল্পরূপ আলোচনায় তা কোনোভাবেই ব্যাঘাত ঘটাবে না।

আত্মকথনের বিবৃতির প্রয়োগযোগ্যতাই হল উত্তমপুরুষের কথকের জবানিতে গল্প বিশ্লেষণ বা বর্ণন বা কথন। রবীন্দ্র-গল্পে দ্বৈত-জবানির প্রয়োগ সুনিপুণ শৈল্পিকতার পরিচায়ক। কারণ দুটি উত্তমপুরুষ পাশাপাশি অবস্থান করলে একে অপরের perspective-এ নিজ অবস্থান পরিত্যাগ করে মধ্যমপুরুষে স্থানান্তরিত হতে হবে তবেই কোনো এক উত্তমপুরুষের কথক আত্মকথনের জবানি গ্রহণ করে গল্প বর্ণনা করতে পারবে। যা আবার shifting point of view-এরও যথাযোগ্য উদাহরণ। এক্ষেত্রে মধ্যমপুরুষ শ্রোতার ভূমিকা নিয়ে উত্তমপুরুষের চরিত্রটির সমস্ত গল্প শ্রবণ করে পরবর্তীকালে উত্তমপুরুষের স্থান নিয়ে সমগ্র গল্পটি পাঠকের সম্মুখে উন্মোচন করে। যদিও গল্প শুরু করেন যে কথক তিনি গল্পের মুখ্য উত্তমপুরুষ চরিত্র নন, বরং উক্ত মুখ্য চরিত্রটির গল্প বর্ণনা করার জন্যই প্রথম আত্মকথকের আবির্ভাব ঘটে – যে গল্পবস্তুর সঙ্গে 'নিঃসম্পর্কিত আমি' চরিত্রেরই মত, যেখানে সর্বজ্ঞলেখকের দৃষ্টিকোণই প্রতিপন্ন হয়। গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর ভাষায় এই ধরনের আমি চরিত্র 'generalised I'[৯] -এ পরিণত হয়। তবে এই আত্মকথকও পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। গল্পবস্তুর প্রতি পাঠকের অধিক বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির জন্যই মুখ্য উত্তমপুরুষের

চরিত্রের জীবনাভিজ্ঞতা তারই আত্মকথনে গল্পের মধ্যে উপস্থাপন করে। এই ধরনের 'আমি' চরিত্রগুলি গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর ভাষায় 'specified I'[১০] -এ পরিণত হয়। এই চরিত্রগুলি নৈর্ব্যক্তিকতাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব অর্জন করে। এই দুই প্রকারের আত্মকথন যখন একই গল্পে ব্যবহৃত হয় তখন দ্বৈত-জবানি লক্ষগোচর হয়। রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের গল্পগুলি হল – 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'দুরাশা', 'ডিটেকটিভ' ও 'বোষ্ঠমী'।

উক্ত গল্পগুলির মধ্যে প্রথম চারটি গল্পের কাহিনি হল অতিপ্রাকৃত জাতীয়। এক্ষেত্রে আত্মকথনের দ্বৈত-জবানি কাহিনির অতিপ্রাকৃতিকতা ও বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য এবং যৌক্তিকতা সম্পাদনের প্রয়াস। কৌতুহল ও রহস্যময়তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার আনয়ন। ''একদিকে রহস্য প্রবণতা ও অন্যদিকে যুক্তিচেতনা''[১১] – লেখকের দুই সত্তার প্রকাশ গল্পের শিল্পরূপকে বিশেষত্ব দিয়েছে।

'কঙ্কাল' গল্পের শুরুতে তিন বালকের কথা বলা হয়েছে যাদের মধ্যে কোনো একজন হল গল্পের প্রথম আত্মকথক। এই কথকই গল্পবস্তুর বাইরের পাঠকের জন্য গল্প উপস্থাপন করেছে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় আত্মকথক এক অশরীরী নারী, যে তার জীবনবৃত্তান্ত প্রথম কথকের কাছে জানিয়েছে। গল্পটিকে অতিপ্রাকৃত পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রয়াস একমাত্র এই অশরীরিণীর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, আদতে গল্পটি হল এক নারীর জীবনজটিলতা, দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি জীবনতৃষ্ণার বৃত্তান্ত। গল্পের প্রথম আত্মকথক চরিত্রটির বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় (স্বপ্ন-কল্পনায়) এই অশরীরিণী আত্মার আবির্ভাব। আবার অশরীরিণী পূর্ব জীবনে যে নারী-মানসিকতার অধিকারিণী ছিলেন তার মধ্যেও স্বাভাবিকতার অভাব ছিলো। এই দুই মানসিক অবস্থাকে পাশাপাশি নির্মাণ করার জন্যই হয়তো লেখক একদিকে যেমন অতিপ্রাকৃত পরিবেশকে গ্রহণ করেছেন তেমনি দ্বৈত-আত্মকথনের দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করেছেন। আত্মকথনের গ্রহনযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন হতে পারে – কেন কোনো বিদেহী আত্মা তার জীবিত অবস্থার কথা মৃত্যুর বহুকাল পরে বলতে এলো, আবার নিজের নারী মনস্তত্ত্বের অস্বাভাবিক অবস্থার পরিচয়ও দেয়, তাহলে তাতে সরস কৌতূহল ও রহস্য থাকলেও বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। আবার ওই চরিত্রের মুখে গল্পটি না বলানো হলেও বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ফেরাবার জন্যই অপর একটি আত্মকথকের নির্মাণ করা হয়েছে কথোপকথনে সমগ্র গল্পটিকে উপস্থাপন করার জন্য, যাতে গল্পটির শিল্পগত আবেদন বহুগুনে বেড়ে গেছে। এই কথকই হল গল্পের প্রথম আত্মকথক যে রসিকতা ও কৌতূহলের ভানে দ্বিতীয় আত্মকথকের সঙ্গে কথোপকথনে তার জীবিত অবস্থার কথা জেনে নিয়েছে, যাতে গল্পে যেমন নাটকীয়তা ফিরে এসেছে তেমনি অতিপ্রাকৃত পরিবেশ ভীতিটিও গেছে।

'কঙ্কাল' গল্পটিকে প্রেমমনস্তত্ত্বের গল্প বললে ভুল হয় না, গল্পটি রাত্রির অন্ধকারে শুরু হয়ে অতিপ্রাকৃত পরিবেশেকে তরাণ্বিত করেছে ঠিকই তবে নারীর প্রেম-তৃষ্ণার প্রচণ্ডতা ও সেই প্রেমকে জয়যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা, আবার নারীর আত্মরূপ সচেতনতা, প্রবল অহংবোধ, তার সঙ্গে কথকের রসিকতা গল্পের আধিভৌতিক অবস্থার রসভঙ্গ করেছে বলা যায়। লক্ষনীয় 'দুপুর-রাত্রি'তে প্রদীপ নিভে যাওয়ার পরে প্রথম আত্মকথকের ঘরে অন্ধকারের মধ্যে 'কেউ' ঘোরাফেরা করতে করতে হঠাৎ মশারীর কাছে এসে প্রশ্ন করে

ফেললো 'আমার সেই কঙ্কালটি কোথায়' – তারই সন্ধানে এসেছি। প্রেতের মুখে কথা শুনে হতভম্ব হবারই কথা, কিন্তু সেই ভীতি কাটিয়ে উঠে কথক পাশবালিশটি চেপে ধরে অতিপরচিতের মত পেতনির রমনী-জীবনের কাহিনি শুনতে লাগলো, তখনই উত্তমপুরুষের কথক এটা অনুভব করলো যে ইনি একজন অশরীরী আত্মঘাতিনী প্রেমিকা। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী অপঘাতে মৃত্যু হলে অতৃপ্ত আত্মা ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, এখানেও অশরীরিণী দ্বিতীয় আত্মকথক বলেছে - 'এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হু হু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি।' আবার লেখক বার বার পাঠককে সচেতন করছেন মূল গল্পের কথক হলেন এক অশরীরী অতৃপ্ত আত্মা বা পেতনি। ভীতির পরিবেশে গল্পটি বর্ণিত একথা পাঠকের দৃষ্টিগোচর করার চেষ্টা হয়েছে বারবার কিন্তু সেই রমণীর জীবন-কাহিনিতে রূপের হিল্লোলে পাঠকের মন উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। ওই রমণী যেমন বাল্যবিধবা তেমনি সুন্দরী, সে এক পুরুষের প্রেমে পড়ে কিন্তু ওই পুরুষকে না পেলে তার মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিহিংসা ও আত্মজিঘাংসা। এই নায়িকার বাসনা ছিলো কল্পনাতীত – সে চেয়েছিলো পৃথিবীর সব পুরুষজাতি হবে তার চরণাগত, যা শশীশেখরের মূর্তিকে অবলম্বন করে সে পেতে চেয়েছিলো। এই ভীষণ আত্মরতি, চূড়ান্ত বিজীগিষা হয়তো তার মানস-ব্যাধি, আসলে প্রেমের চরম পর্যায় তো ব্যাধিরই সমতুল্য। এ নায়িকা আত্মনিবেদন পর্যায়ের নয় কিন্তু বিচ্ছেদ-যন্ত্রনার ভাবনায় তার বুক ফেটে যায়, আবার না পাবার অপমানবোধে সে পরাজিতও অনুভব করে। তাই সে শশিশেখরের পানীয়ে বিষ মেশালো এবং নিজেও বিষ পান করলো। এই ধরনের আত্মঘাতী পরিণামে প্রথম কথকের মন্তব্য 'গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর' – সমগ্র অস্বভাবিকতা, অতিপ্রাকৃতিকতাকে জীবনের বিশ্বাসযোগ্যতায় ফিরিয়ে আনার শিল্পসার্থক প্রচেষ্টা।

'নিশীথে' গল্পের দ্বৈত কথকই হলো গল্পের মুখ্য উত্তমপুরুষের চরিত্র – ডাক্তার ও তার রোগী জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। দুই চরিত্রের কথোপকথনকে প্রকটভাবে দেখানোর জন্যই লেখক দ্বৈত-আত্মকথনরীতির জবানি গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণাচরণ মানসিকভাবে অসুস্থ এক চরিত্র, যে রাত্রি হলেই এক 'অতিপ্রাকৃত' রহস্যময়তাকে অনুভব করে। এজন্য ভয় পেয়ে সে আশ্রয় পাওয়ার জন্য অথবা সুস্থ অবস্থা ফিরে পাবার জন্য মধ্যরাত্রে তার ঘনিষ্ট ডাক্তারের কাছে এসেছে, আর তার জীবনের সমস্ত ঘটনা ডাক্তারকে বলেছে। এক্ষেত্রে তাই ডাক্তার ও রোগীর কথোপকথন তাদের মুখ দিয়ে বলানো অনেক বেশি যৌক্তিকতাপূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, মুখ্য গল্পবস্তু দক্ষিণাচরণের জবানিতে পাঠক যেমন উপভোগ করেছে তেমনি সামগ্রিক গল্পের বিশ্বাস্যোগতা ও কৌতূহল বজায় রাখতে ডাক্তারের উপর প্রথম আত্মকথকের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এখানে যেন দক্ষিনাচরণের জীবনে যে 'অতিপ্রাকৃত' অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই ডাক্তার, তাই তারই আত্মকথনে সমগ্র গল্পটি বিবৃত।

অতিপ্রাকৃত অবস্থার শুরু হয় দক্ষিণাচরণের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর। দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে নদীর ধারে ঘুরে বেড়ানোর সময় 'ও কে ও কে ও কে গো' এই শিহরণ জাগানো রহস্যময় উক্তির মধ্য দিয়ে অতিপ্রাকৃত-রহস্যের সৃষ্টি করেছেন লেখক। অবশ্য এই ডাক রাতচরা পাখির ডাক বলে রহস্যকে বাস্তব যৌক্তিকতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এরপর আবার শয়নকক্ষে 'হা হা' হাসির ধ্বনির সঙ্গে 'ও কে ও কে' শব্দ দক্ষিণচরণের জীবনে রহস্যময় অতিপ্রাকৃতিকতা ঘুরপাক খেতে থাকে। এই রহস্যময় ধ্বনি দক্ষিণাচরণের

জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়ে প্রত্যেক রাত্রেই তাকে অতিষ্ট করে তোলে, সে রাত্রেও এমনই ঘটনা ঘটেছিলো, তাই সে ডাক্তারের কাছে ছুটে এসে আপন জীবনের গল্প বলতে থাকে। আবার দক্ষিণাচরণ কাহিনিটি কথনের সময় হঠাৎ হঠাৎ চুপ করে বসে পড়ছিলো, যেন তার চিত্তস্থিরতা নষ্ট হয়ে তার চেতনা রহস্যের মধ্যেই ডুবে যাচ্ছিলো। – গল্প কথনের এই কৌশল আত্মকথনরীতির বাস্তবতাকে অনেক বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে। দক্ষিণাচরণের গল্প শেষ হতে হতে অন্ধকার কেটে যায়, যেন তার মনের অতিপ্রাকৃত রহস্যেরও লাঘব হয় এবং সে লজ্জিত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ডাক্তারের কাছ থেকে চলে যায়। এখানে দক্ষিণাচরণের গল্প শেষ; কিন্তু ডাক্তারের গল্প শেষ হয় তার পরবর্তী রাত্রিতে – "শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, 'ডাক্তার! ডাক্তার!' " এইভাবে ডাক্তার ও রোগীর কথোপকথনে আত্মকথন রীতির দ্বৈত-জবানি শিল্পগতভাবে গল্পটিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে।

অস্বাভাবিক-অতিপ্রাকৃতিকতার রহস্যময়তা থেকে সরে এসে এবার রবীন্দ্রনাথ অবাস্তব-অতিপ্রাকৃতিকতার রহস্যকে ব্যবহার করলেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে। এখানে দ্বৈত আত্মকথকের জবানি প্রয়োগের মূলে প্রথম কথকের অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানা-পোড়েনের দোদুল্যমানতাকে প্রকট করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়-কথকের গল্প বলার অসাধারণ ভঙ্গিমা ও নিজেকে অন্যের কাছে উপস্থাপন করার অভিনব ক্ষমতাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই পদ্ধতির দ্বারা লেখক অবাস্তব-অতিপ্রাকৃতকতার মায়াজালের মধ্যেও গল্পের বাস্তবতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। গল্পটি বিবৃত হয়েছে এক রেলস্টেশনের বিশ্রামাগারে, যেখানে গল্পের প্রথম কথক ও তার থিয়সফিস্ট আত্মীয় দ্বিতীয় কথকের শ্রোতা। গল্পের শুরু থেকেই অবাস্তব-কাহিনিটির প্রতি প্রথম কথকের বিশ্বাস না থাকলেও থিয়সফিস্ট আত্মীয়টির যথেষ্ট বিশ্বাস ছিলো – এ নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুক করতে করতে গল্পটি এগিয়েছে। কিন্তু কাহিনি শেষ হবার আগেই ট্রেন চলে এলে প্রথম কথক বলে ফেলে 'এত শীঘ্র', অর্থাৎ প্রথম কথক রহস্যের মধ্যে যথেষ্ট আবিষ্ট হয়েছিলো তবুও সে সমগ্র গল্প জুড়ে নিজেকে প্রচার করেছে অতিপ্রাকৃতে-অবিশ্বাসী বলে। এই তর্কসূত্রেই নাকি আত্মীয়টির সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ হয়ে যায়।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে যে ইরানী-নারী ও রহস্যময় প্রাসাদের গল্প বলা হয়েছে, সেই গল্পকথক ও পাঠকের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব আছে। সেই দূরত্ব কাটাতে এক যুক্তিপ্রবণ আধুনিক চেতনা সম্পন্ন কথক-চরিত্র স্থাপন করা হয়েছে, যে যৌক্তিকতার দাবি তুলে অবাস্তবতাকে উড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু নিজের কৌতূহল দমন করতে পারেনি, যেন কোনো বাস্তব কাহিনির বিবৃতি হচ্ছে অবাস্তব-রহস্যময়তার প্রলেপ দিয়ে, আর তাই হয়তো রহস্যময়তার অতিপ্রাকৃত জগতে পাঠকও কাহিনির মধ্যে আবিষ্ট হতে বাধ্য হয়েছে কথকের মতোই। লেখক তাঁর এই বিশিষ্ট ভঙ্গিমার দ্বারা গল্পের 'অতিপ্রাকৃত-রহস্যময়' জগতের অবাস্তবতার সঙ্গে কথকের আধুনিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে জড়িয়ে দিয়ে পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। আবার দ্বিতীয় আত্মকথক গল্পে জানিয়েছে যে, তাকেও এই রহস্যময় অতিপ্রাকৃতিকতাকে অনুভব করতে হয়েছে অর্থাৎ ওই অতিপ্রাকৃতিকতার কুহকে তাকেও পড়তে হয়েছিলো কিন্তু সে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলো – এ কথার মধ্যেও আবার রহস্য ও অবাস্তবতার গন্ধ রয়েছে। এই রহস্যময়তাকে উদ্ঘাটন করতেই সে করিম খাঁর কাছে ছুটে যায় এবং ইরানী

নারীর অতিপ্রাকৃত জীবনকাহিনী জানতে পারে, কিন্তু সমগ্র গল্পটা প্রথম কথকের কাছে বিবৃত করতে পারেনি। এই রহস্যময় জগতের প্রতি আবেশ বিহ্বল অবস্থা দ্বিতীয় কথক তার আত্মকথনে অতি কৌতূহলউদ্দীপন করেই নির্মাণ করেছে যাতে ঘটনার অবাস্তবতা বিশ্বাসযোগ্যতাই ফিরেছে। আবার প্রথম আত্মকথক ইরানী নারীটির প্রতি অমোঘ আকর্ষণে প্রাসাদের মধ্যে ছুটে গিয়েছে, অথচ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মন রহস্যময়তাকে মানতে চাইছে না, ওই অবস্থাকে অতিক্রম করতে চাইছে; এই অতিপ্রাকৃত পরিবেশে আত্মসচেতন হবার প্রয়াসকে আত্মকথনেই গল্পের মধ্যে উল্লেখ করেছে, যা মনস্তাত্ত্বিক আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসাকে প্রকাশিত করেছে পাঠকের কাছে। ফলে গল্পটি আত্মকথনরীতির প্রয়োগের শিল্পগত বিচারে যথাযথ হয়েছে নিঃসন্দেহে।

'মণিহারা' গল্পে প্রথম কথক হচ্ছে স্কুলমাস্টার এবং দ্বিতীয় কথক ফণিভূষণ সাহা । মূল গল্পবস্তু হল ফণীভূষণের জীবনবৃতান্ত যা সে নিজ জাবানিতেই বলেছে প্রথম আত্মকথকের কাছে, অপরদিকে পাঠকের কাছে সে গল্পের উদ্ঘাটন হয়েছে স্কুলমাস্টারের মুখ দিয়ে। আত্মকথনরীতির অভিনব প্রয়োগ 'মণিহারা' গল্পটিকে অনন্যতা দিয়েছে। এখানে ফণিভূষণ চরিত্রটিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করেছে স্কুলমাস্টার, যাতে ফণিভূষণের ত্রুটির দিকগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যেমন ফণিভূষণকে তেমনি পাঠককেও। ফলে ফণিভূষণ চরিত্রটি তার শোককে অতিক্রম করতে পেরেছে আর পাঠককে এক নতুন বিশ্লেষণাত্বক মনভাবাপন্ন করে তুলেছে। এই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লেখক গল্পের মধ্যে দ্বৈত আত্মকথকের দৃষ্টিকোন প্রয়োগ করেছেন। যেখানে প্রথম আত্মকথক গল্প উপস্থাপন করলেও তার ভূমিকা আসলে শ্রোতার। আর দ্বিতীয় আত্মকথক ফণিভূষণ সাহার গল্পটি বললেও তা ভূমিকা যেন সর্বজ্ঞ কথকের – অর্থাৎ দুই কথকই আসলে 'generalised I'.

স্কুলমাস্টারের বর্ণিত ফণিভূষণের জীবনকাহিনিতে অতিপ্রাকৃতিকতা এসেছে তার স্ত্রী মণিমালিকাকে ঘিরে। মণিমালিকা নিজের অলঙ্কারের লোভে ফণিভূষণকে ছেড়ে চলে যায় কিন্তু শেষপর্যন্ত তার মৃত্যু হয়, আর সেই মৃত মণিমালিকার অলঙ্কার সহ কঙ্কাল ফণিভূষণকে আহ্বান করে নিয়ে যায় নদীর স্রোতের মধ্যে – এই ঘটনাটি নিছক অতিপ্রাকৃত বলেই মনে হয়। স্কুলমাস্টারের গল্পের দ্বারা লেখক এখানে ফণিভূষণের শোকাচ্ছন্ন অবচেতন সত্তার পরিচয় দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিকভাবেই। এমতাবস্থায় ফণিভূষণ তার অবচেতন সত্তার আচ্ছন্নতাকে টের পায় এবং বাস্তব জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে অতিপ্রাকৃতকতার মধ্যেই গল্পে বিশ্বাসযোগ্যতা অনায়াসেই ফিরে আসে। যেকারণে ফণিভূষণ সাহা কৌতুক করে নিজের স্ত্রীর নাম বলে 'নৃত্যকালী'। এখানেও লেখকের অপর একটি কৌশল লক্ষনীয় – গল্পের মধ্যে ফণিভূষণ তার জীবনে যেমন বাস্তবতা ফিরে পেয়েছে, তেমনি পাঠকের কাছে অতিপ্রাকৃত ও বাস্তব অর্থাৎ বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলাচলতা সৃষ্টি হয়েছে এই 'নৃত্যকালী' নামটি প্রয়োগের দ্বারা। এভাবে সমগ্র গল্পজুড়ে অভিনব পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টিতে দ্বৈত জবানির আত্মকথনরীতির প্রয়োগ লেখকের শিল্পসমৃদ্ধ অবদান। ।

'দুরাশা' গল্পটি আসলে একটি রোমান্সধর্মী গল্প। এই রোমান্সকাহিনি বদ্রাওনের নবাব কন্যার জীবনের আখ্যান, যা সে তার আত্মকথনেই বলেছে – ফলে কিছুটা হলেও বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুন্ন হতে দেখি। যেকারণে লেখক অপর একজন আত্মকথকের প্রয়োগ ঘটালেন সমগ্র গল্পটি উপস্থাপন করতে, তখন এই গল্পের মুখ্য

চরিত্র হয়ে উঠলো রাজকুমারী। দ্বৈত কথকের দৃষ্টিকোণ প্রয়োগে গল্প বিশ্লেষণে বাস্তবতা এসেছে। আসলে লেখক বদ্রাওনের রাজকুমারীর দু:সাহসী প্রেমের হতাশাপূর্ণ পরিণতি যুক্ত অতীতাশ্রয়ী রোমান্সধর্মী কাহিনি নির্মাণ করলেও রাজকুমারী চরিত্রটির মানবিক সংবেদনশীল প্রেমপূর্ণ হৃদয়টির পরিচয় দিয়েছেন। তাই ঐতিহাসিক রোমান্সধর্মী কাহিনির পর্যায় অতিক্রম করে গল্পটি পৌঁছে গেছে মনস্তাত্ত্বিকতার পর্যায়ে, শুধুমাত্র অপর আত্মকথকের দ্বারা নারীমনসতত্ত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমগ্র গল্প উপস্থাপনে। প্রথম কথক গল্পটি পাঠকের কাছে উপস্থাপন করার সময় প্রতিনিয়ত রোমান্সের জালকে অবাস্তবতা ও অবিশ্বাসের অস্ত্র দিয়ে ছিন্ন করার যেন এক অহেতুক প্রয়াস করেছে। তাই আত্মকথকের শেষ মন্তব্য 'কিছুই হয়তো সত্য নহে'। এর ফলে লেখক কাল্পনিক রোমান্স লেখার দায় থেকে যেমন মুক্ত হলেন তেমনি রাজকুমারীর আবির্ভাব ও তার আখ্যানকে অবাস্তবতার বেড়াজালে বেঁধে দিলেন। কিন্তু এর মধ্যে থেকেও পাঠকের অনুভূতি স্পর্শ করলো রাজকুমারীর নারীমনের সংবেদনশীল প্রেমপূর্ণ হৃদয়টি, যা মানবিকতায় পরিপূর্ণ। এই অনন্য সৃষ্টিশীল প্রয়াস একমাত্র আত্মকথনরীতিতেই সম্ভব।

'ডিটেকটিভ' গল্পের কথনরীততে বিশেষ অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়, এখানে দ্বৈত আত্মকথনরীতির প্রয়োগ থাকলেও তা টেরই পাওয়া যায় না। গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে একটি বাক্য মাত্র পাঠকে হঠাৎ নাড়া দেয় - 'আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেকটিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম,...।' – এতক্ষন তো আমরা সমগ্র গল্পের কথক হিসাবে মহিমচন্দ্রকেই দেখছিলাম, যে তার জীবনের কথা আত্মকথনে বলছিলো, তাহলে এই 'আমি' চরিত্রটি কে? পাঠককে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। পাঠকের চকিত চমক ফিরলে সে অনুভব করে গল্পটি আসলে দ্বৈত আত্মকথনরীতির। উক্ত 'আমি' চরিত্রটি আসলে গল্পের প্রথম কথক, যার কাছে মহিমচন্দ্র (দ্বিতীয় কথক) তার জীবনের চোর ধরার কাহিনিটি ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলো। তবে সমগ্র গল্পটি প্রথম কথক বিবৃতির সময় মহিমচন্দ্রেরই বয়ান ব্যবহার করেছেন। অভিনব এই প্রয়োগের একটা কারণ খোঁজা যেতে পারে, এই মহিম অর্থাৎ দ্বিতীয় কথক আসলে গল্পের মুখ্য চরিত্র, যে তার আমিত্ব সম্পর্কে খুব সচেতন। সে তার নিজের গুণে 'সুন্দরী স্ত্রীকে যেমন বশ' করেছে 'বিমুখ অদৃষ্ট লক্ষীকেও তেমনি বশ' করতে চায়। আর এ ব্যাপারে সে খুব আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু গল্পে শেষ পর্যন্ত জানতে পারা যায় মহিমচন্দ্র যে চোরকে ধরার প্রয়াস করছিল এবং শেষপর্যন্ত ধরেছিল সে আসলে তারই স্ত্রী। তখন তার আমিত্বের প্রতি গর্ববোধ চুপসে যায়। এই মুহূর্তে লেখকও অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে মহিমচন্দ্র নামক 'আমি'কে সরিয়ে দিয়ে পাঠকের কাছে অপর এক আত্মকথককে সামনে দাঁড় করিয়ে দেন – আসলে এই আত্মকথক এতক্ষনে পাঠকের সচেতন দৃষ্টিতে আসে এবং পাঠক অনুভব করে যে এই কথকই গল্পটি প্রথম থেকে তার কাছে উপস্থাপন করছিলো। এইভাবে মহিমচন্দ্রের আমিত্বের সংকট দূর হয়েছে গল্পের মধ্যে। অর্থাৎ মহিমচন্দ্র যখন তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অনুশোচনাগ্রস্ত ও লজ্জাগ্রস্ত, তখন সে তার জীবনের ঘটনাকে অন্য আর একজনের কাছে বলে নিজের হতাশ অবস্থাকে দূর করে স্বস্তি পেতে চেয়েছে। ফলে অপর আর এক আত্মকথকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই বিশেষ গঠনভঙ্গিতে গল্পের বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি রক্ষিত হয়েছে।

'বোষ্টমী' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের জীবনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে জড়িত; একথার প্রমাণ পাওয়া যায় শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে, এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৯), রবীন্দ্রনাথের দ্বারা হেমন্তবালাকে লিখিত পত্রে (প্রবাসী, ১৩৩৯) প্রভৃতি স্থানে। অর্থাৎ এ গল্পের বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে লেখক অনেকবেশি দায়বদ্ধ। তাহলে গল্পটির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাই বোষ্টমীর জীবনদর্শন ও কথকের বৃহত্তর জীবনদৃষ্টির দ্বারা সমগ্র গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে। গল্পে দেখা যায় প্রথম কথক নিজের জীবন সম্পর্কে যতটা সচেতন ততটাই সচেতন তার সঙ্গে বোষ্টমীর সম্পর্ক নিয়েও, একথাও স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রথম কথক বোষ্টমীর গল্প বলবো বলেই লেখনী ধারণ করেছে (গল্পে সে একজন লেখক)। বোষ্টমীর জীবনদর্শন তার জবানিতেই শুনে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করেছেন পাঠকের কাছে। এই সূত্রে প্রথম কথক হয়ে উঠেছে বোষ্টমী ও পাঠকের মধ্যকার সংযোজক। ফলে গল্পটি বেশ নাটকীয় হয়ে উঠেছে এবং দ্বৈত-আত্মকথনরীতির প্রয়োগও শিল্পসফল হয়ে উঠেছে।

এইভাবে 'generalised I' ও 'specified I'-এর সমন্বয়ে দ্বৈত-আত্মকথকের জবানি প্রয়োগে গল্পগুলি সার্থক হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির শ্রেষ্ঠত্বের মূলে আছে নরনারীর মনের অতল রহস্যলোক ও তার উদঘাটন। আর একারণেই রবীন্দ্রনাথ গল্পে আত্মকথনরীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাই একথা বলতে কোনো বাধা নেই যে, আত্মকথনরীতির পরিপ্রেক্ষিতেই ''মানব মনের অতল রহস্য-গভীরতার সংহত ব্যঞ্জনাময় রূপটি সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্যতায় প্রতিফলিত হতে পারে''।

তথ্যসূত্র

১. রায় নীহাররঞ্জন, 'রবীন্দ্র-সাহত্যের ভূমিকা', নিউ এজ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৯, পৃ.৩৮৪ ।
২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ ।
৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ ।
৪. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'সাহিত্যে ছোটগল্প', ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা-৩, নব সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৫, পৃ. ২৪৫ ।
৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ ।
৬.রায়চৌধুরী গোপীকানাথ, 'নিরীক্ষণবিন্দু(পয়েন্ট অফ ভিউ)', অলোক রায় সম্পাদিত, "সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য", সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০২, পৃ. ১১৪-১১৫।
৭. আচার্য যাদবেশ, 'গল্পকার অমিয়ভূষণ: জীবনদৃষ্টি ও প্রকরণ চেতনা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৮১ ।
৮. চৌধুরী ভীষ্মদেব, 'উত্তমপুরুষের গল্প', আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, 'সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২৫ বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৪৩২।
৯. রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, 'রবীন্দ্রনাথ:ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প', সাহিত্যলোক, কলিকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪০৪, পৃ. ৩০।
১০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৪।
১১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ ।